দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৯৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 JAN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

(১১)

005

পরীক্ষা ও কেন্দ্র বাতিল

অবাধে নকলের অভিযোগে সরিষাবাড়ী ও ধনবাড়ীসহ দেশের বেশ কয়েকটি কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র এবং ঐসব কেন্দ্রে ১৯৮৮ সালে গৃহীত সকল পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বর্তমান ত গেছেই ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থাটা কোন্ পর্যায়ে গেছে তা কারো অজানা নয়। অনেক জায়গায়ই এটা রীতিমত প্রহসনে পরিণত হয়েছে, নকল গণটোকাটুকির পর্যায়ে পৌছেছে। খও কাগজে, প্রশ্নোত্তর লিখে না এনে নকলবাজরা বই খুলেই বসে পড়ে। কোন কোন জায়গায় বাইরে থেকে খাতা লিখিয়ে আনারও অভিযোগ পাওয়া যায়।

নকলের কারণে শুধু ছাত্র-ছাত্রী তথা লেখাপড়ার মানই রসাতলে যাচ্ছে না, অফিস-আদালতের কাজ-কর্মের মানও নেমে যাচ্ছে। কেননা একথা ত অস্বীকার করা যায় না যে, নকলবাজরা অধিকাংশ পাস না করলেও কিছু কিছু উত্তীর্ণ হয় এবং নকল মেধার জোরে চাকরি-বাকরিও পেয়ে যায়।

এই অবস্থায় নকল বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য কেন, কি পরিবেশে, কোন্ কোন্ কারণে নকল হচ্ছে সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

পরীক্ষাটা একদিনে প্রহসনে পরিণত হয়নি। সকলের চোখের সামনে অবাধ নকল সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট সকলে এই প্রক্রিয়া অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, এই বক্তব্য আসলে দায়িত্ব এড়াবার অজুহাত মাত্র। যার যা করণীয় ছিল সময়মত সকল পর্যায়ে তারা তা করলে আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছাত না।

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বাইরে থেকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বিদ্যাচর্চার জায়গায় অস্ত্র চালনায় কসরৎ চলেছে এবং বাস্তবে তার প্রয়োগও হয়েছে। মাসের পর মাস কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। নকলবাজ এবং মস্তান ছাত্ররা শাস্তির পরিবর্তে প্রথমে প্রশ্রয় পেয়েছে। পরে মাথায় ওঠার পর নামানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কোন কোন শিক্ষককে শিক্ষকতার মহান আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে দেখা গেছে। সোজাকথা অবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বলিষ্ঠতার সাথে মোকাবেলা করা হয়নি।

পরীক্ষা পদ্ধতি বদলাবার সুপারিশও করা হয়েছে। কাগজে ফর্ম, তাত্ত্বিক আলোচনা সবই হয়েছে। আসল যে করণীয় সেই বাস্তব প্রয়োগটাই হয়নি।

প্রশ্নপত্রের ধরন বদলানো, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা ইত্যাদি ভবিষ্যতের ব্যাপার। এসবের কথা বলে বর্তমানে যে অবাধ নকল চলছে তাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

নকল যারা করেছে তাদের পাশাপাশি যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং পরোক্ষ প্রশ্রয়ে তারা নকল করতে সাহস পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

এমন অনেক কলেজ আছে যেগুলোতে নিয়মিত ক্লাস করে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ধরা যাক ১০০ জন। অথচ দেখা যায় সেসব কলেজ থেকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে দু থেকে তিন শ' বা তারো বেশী ছাত্র-ছাত্রী।

পরীক্ষাটা অনেক কলেজ এবং কলেজ শিক্ষকের আয়ের একটা প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। নকল ধরে শিক্ষক লাঞ্ছিত, প্রহৃত হন, তার জীবননাশের হুমকি আসে-এ যেমন সত্যি, তেমনি নকলের সুযোগদান অনেকের আয়ের বিকল্প বা অতিরিক্ত উৎস হিসেবে কাজ করছে,—এও তেমনি নিদারুণ সত্যি যার কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই নকল বন্ধ করতে হলে এর প্রশ্রয়দানকারীদেরও কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

কোন কেন্দ্রে অবাধে নকল হলে প্রয়োজনবোধে সেই কেন্দ্র বাতিল করে দেয়ার মত ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। তাহলো একটি কেন্দ্রের পাঁচ/সাত শ' ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সকলেই কি নকল করে? পাঁচ/সাতজন ছাত্র-ছাত্রীও কি নকল ছাড়া পরীক্ষা দেয় না? আমাদের ত ধারণা যেসব কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে, সেখানে সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা পরীক্ষায় নকল করেনি এবং নকল ছাড়াও তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতো। কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করায় তারা অন্যায়ভাবে শাস্তি পেয়েছে, তারা হয়েছে পাইকারী শাস্তির শিকার। দশজন নকলবাজ তথা অসৎ পরীক্ষার্থীর জন্য একজন সৎ পরীক্ষার্থীকে শাস্তি দেয়া যায় না। ইতিমধ্যে বাতিল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় চিঠিও লিখেছেন।

কর্তৃপক্ষের উচিত এদের প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য বিকল্প পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। বাতিল হয়ে যাওয়া কেন্দ্রসমূহের যেসব পরীক্ষার্থী নকল না করে পরীক্ষা দিতে চায় তাদের জন্য জেলা সদরে বিকল্প পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

যারা নকল করবে তাদের যেমন শাস্তি প্রাপ্য, তেমনি যারা সৎভাবে পরীক্ষা দিতে চায় তাদের জন্য নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এটা সৎ পরীক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। সে ক্ষেত্রে তাদের শাস্তির শিকার হতে হয় না।